গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ - ২ জানুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে বর্বর পুলিশি আক্রমণের নিন্দা

এস ইউ সি আই (সি)-র

বর্বর পুলিশি আক্রমণ চালিয়ে এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের হত্যা, শত শত জনকে আহত ও গ্রেপ্তার করার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

এ কথা আজ পরিষ্কার যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, জনবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি এনআরসি এবং সিএএ চালুর পরিকল্পনা দেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতিমধ্যেই এনআরসি এবং সিএএ প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষ পুলিশি আক্রমণ মোকাবিলা করে স্বতঃস্ফূর্ত ও লাগাতার গণআন্দোলনে ফেটে পড়েছে।

এই সংগ্রামে, বিশেষত ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের যে সাহস এবং অদম্য মনোবলের প্রকাশ দেখা গেল, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। দেশের সংগ্রামী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন নতুন উদ্যমে এই আন্দোলন চালিয়ে যান এবং বেকারি, ছাঁটাই ও মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধেও দাবি তোলেন।

জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, দীর্ঘস্থায়ী, সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত আন্দোলন পরিচালনার জন্য এলাকায় এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা তৈরি করুন। একমাত্র এই পথেই জনগণের দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করা যায়।

দেশজোড়া আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে
মোদি-শাহরা মিথ্যাচারের রাস্তা নিয়েছেন

সংশোধিত নাগরিক আইন এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে কতখানি বেসামাল হয়ে পড়েছে বিজেপি সরকার, ২২ ডিসেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট।

আন্দোলন যখন সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কোনও ভাবেই তাকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না তখন প্রধানমন্ত্রী কোনও রকম নীতি-নৈতিকতা, এমনকি চক্ষুলজ্জারও পরোয়া না করে একটি নির্জলা মিথ্যা বললেন— এনআরসি নিয়ে সরকারের মধ্যে কোনও কথাই হয়নি। উল্টে দাবি করেছেন, প্রতিবাদীরা মিথ্যা বলছে।

প্রতিবাদীদের কথা পরে হবে। দেখা যাক নরেন্দ্র মোদি সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা কী বলেছেন। গত প্রায় বছরখানেক ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি জে পি নাড্ডা সহ বহু নেতা-মন্ত্রীই বলে আসছেন দেশজুড়ে তাঁরা এনআরসি করবেনই। সদ্য সমাপ্ত রাজ্যসভার অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "কোনও সংশয় রাখবেন না, এনআরসি গোটা দেশেই হবে। দেশের সব রাজ্যে অসমের ধাঁচে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি হবেই এবং তা হবে ২০২৪ সালের ভোটের আগেই।" তা হলে কে মিথ্যা কথা বললেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে নাকি তাঁর দলের সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর

মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও অঙ্গ - লেনিন

ভিতরের পাতায়

রাজ্যে রাজ্যে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে গ্রেপ্তার এসইউসিআই(সি) নেতারা

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে এনআরসি-সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ এসইউসিআই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড ডি রাঘবেন্দ্র, কমরেড সি এল রামকৃষ্ণ রেড্ডি, কমরেড মালিক দথ কুমার এবং ছাত্রনেতা কমরেড মহেশকে গ্রেপ্তার করে। ঝাড়খন্ডে মিছিল করায় দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয় বিজেপি সরকারের পুলিশ। গুজরাটের ভদোদরায় জেলাশাসকের দপ্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি) নেতা তপন দাশগুপ্ত গত ২০ ডিসেম্বর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিএম-এর ইন্দ্রজিৎ সিং গ্রোভার, ধানজি পারমার এবং পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস সংগঠনের মঞ্জুর সালেরি। আগের দিন ১৯ ডিসেম্বর তাঁরা এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করতে চাইলে অনুমতি দেয়নি পুলিস। এ দিন স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

এনআরসি বিরোধী মিছিলে মাইক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

সাম্প্রদায়িক মদতপুষ্ট নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসি বাতিলের দাবিতে ২১ ডিসেম্বর বীরভূমের সিউড়িতে মিছিলের

ছয়ের পাতায় দেখুন

৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের ডাক

এ আই ইউ টি ইউ সি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে ওই একই দিনে সারা ভারত ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিল এ আই ডি এস ও। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ জানান, এন আর সি এবং সি এ এ সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে এবং এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ডি এস ও এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটে ডি এস ও-র অন্যতম দাবি—বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বাতিল করতে হবে। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯-এর বিরুদ্ধে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন আই আই টি সহ দেশব্যাপী ছাত্ররা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। এই আন্দোলনে পুলিশ বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্ররা সর্বাত্মক ধর্মঘট করে এর সমুচিত জবাব দেবে।

অন্যদিকে এ আই ইউ টি ইউ সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী লেবার কোড বাতিলের দাবিতেই এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। কেন লেবার কোড শ্রমিক স্বার্থবিরোধী? কারণ এই কোড মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে শ্রমিক ছাঁটইয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতা। স্থায়ী কাজে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের নীতিকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করেছে এই কোড।

এই কোডকে হাতিয়ার করে মালিকরা কাজ বাইরে পাচার করতে পারবে, সরকারের অনুমতি ছাড়াই মালিক কারখানা বন্ধও করে দিতে পারবে। সর্বোপরি এই কোড শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া, ইউনিয়ন গঠন করা, ধর্মঘট করা ইত্যাদি অধিকার হরণ করবে। এক কথায় দাসত্বের এই কোড শ্রমিক শ্রেণি মানবে না। তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ধর্মঘট হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে মিছিলে সামিল হচ্ছে, রাস্তা অবরোধ করছে, পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে। শুধু উত্তরপ্রদেশেই পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জন প্রতিবাদীর। কর্ণাটকে ২ জন, আসামে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। বাস্তবে এমন দেশজোড়া আন্দোলন দেশ দেখেনি বহুদিন। সাতের দশকের গোড়ায় কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলন ফেটে পড়েছিল। কিন্তু তা এবারের মতো এমন দেশজোড়া চেহারা নেয়নি। দিশাহারা হয়ে পড়ছেন নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা, বিজেপি নেতারা। দিশাহারা হয়েই তাঁরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

নাগরিকত্বের নামে ভাঁওতা দিচ্ছে বিজেপি

একের পাতার পর

মিথ্যা বলছেন, সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে বলছেন, ক্রমাগত কথা বদলাচ্ছেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, অন্য মন্ত্রীদেরও এই মিথ্যাচারে সামিল করেছে দল। যেমন অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেছেন, যে এনআরসি শুরুই হয়নি, তার সাথে যেভাবে নাগরিকত্ব আইনকে (সিএএ) যুক্ত করা হচ্ছে তাতে তিনি বিস্মিত। আর একজন প্রবীণ মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদও একই কথা বলেছেন। তাঁরা বলছেন, সিএএ-র সাথে তো মুসলিমদের কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তারা কেন প্রতিবাদ করছে? কখনও বলছেন, সিএএ নাগরিকত্ব কাড়ার আইন নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন।

এইসব মন্ত্রীরা এমন ভাব করছেন যেন তাঁরা সত্যিই এই দুই আইনের মধ্যে সংযোগ বোঝেন না। বাস্তবে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তাঁরা তাঁদের দলের সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেরই বিরোধিতা করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ ব্যাপারে কখনওই ভুল বোঝার কোনও অপেক্ষা রাখেননি। গত ১ মে পশ্চিমবাংলার বনগাঁর এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "আমরা প্রথমে পাস করাব নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, তারপরেই হবে এনআরসি।" ২৩ এপ্রিল দলেরই একটি ইউটিউব চ্যানেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "প্রথমে নিয়ে আসা হবে ক্যাব। এর মধ্য দিয়ে শরণার্থীরা সবাই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। তারপর নিয়ে আসা হবে এনআরসি। ফলে শরণার্থীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। উদ্বিগ্ন হবে অনুপ্রবেশকারীরা। এই দুইয়ের ক্রমটা বুঝুন।" এ রাজ্যে রায়গঞ্জের একটি সভায় ১১ এপ্রিল তিনি বলেছিলেন, "আমরা সারা দেশে এনআরসি চালু করব। আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ছাড়া বাকি প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করব।"

এত স্পষ্ট করে বলা সত্ত্বেও বিজেপির যে নেতা-মন্ত্রীরা এখন উল্টো কথা বলছেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা, এ নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি?

বিজেপি-এজিপির দাবি আসামে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এনআরসি শুরু হয়েছিল। সেদিন বিজেপি নেতারা আসামের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, এনআরসিতে তাদের কোনও ভয় নেই। শুধুমাত্র মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরাই এর দ্বারা নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ পড়বে এবং সেই সংখ্যাটা কমপক্ষে ৫০-৬০ লক্ষ। বাস্তবে দেখা গেল, বাদ পড়া ১৯ লক্ষ মানুষের মাত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার মুসলমান, বাকিরা বেশির ভাগই হিন্দু বাঙালি এবং আসামের জনজাতি-আদিবাসী। এই ঘটনায় হিন্দুরা, জনজাতি-আদিবাসীরা বিজেপি-বিরোধী ক্ষোভে ফুঁসে উঠল। বেকায়দায় পড়ে গেলেন বিজেপি নেতারা। ভোটব্যাঙ্ক বাঁচানোর তাগিদে বিজেপি নেতারা দাবি তুললেন, আসামের এই এনআরসি বাতিল করতে হবে। বাদ পড়া হিন্দুদের ক্ষোভ সামাল দিতে দিল্লির নেতারা তড়িঘড়ি নিয়ে এলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। বললেন, বাদ পড়া হিন্দুরা সবাই এই আইনে নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। এর পরেও কি কারও বুঝতে অসুবিধা হবে দুই আইনের সংযোগ কোথায়? যাঁরা এই কয়েক মাস আগে নিজেদের যথার্থ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নানা রকম তথ্য সরকারি দপ্তরে জমা দিয়েছেন, তাঁরা এখন আবার কেন নিজেদের শরণার্থী বলে দাবি করবেন? এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্যাঁচে ফেলে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির খেলায় মেতেছেন বিজেপি নেতারা।

বিজেপি নেতাদের আর এক লক্ষ্য পশ্চিমবাংলার গদি। '২১ সালেই বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে নানা কারণে বিজেপির পক্ষে যে সমর্থন ছিল, বিজেপি নেতারাও বুঝেছেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতার ফলে এই সমর্থনে ভাল রকম ভাটার টান ধরেছে। তা হলে উপায় কী? উপায় বিজেপির অত্যন্ত পুরনো এবং পরিচিত অস্ত্রটিরই প্রয়োগ— ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা। তার জন্য দ্রুত সংশোধন করা হল নাগরিকত্ব আইন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা।

আসামে লাখে লাখে হিন্দুদের নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার ঘটনা এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আশঙ্কা তৈরি করেছে। বাস্তবে আসামে এনআরসির নামে মানুষের ব্যাপক হয়রানি, আর্থিক বোঝা এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যে তার পরিচালনা সারা দেশে এনআরসির সত্যিকারের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়েই জনমনে শুধু প্রশ্নই তুলে দেয়নি, তাদের আতঙ্কিতও করে তুলেছে। এই রকম অবস্থায় পড়েই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বিজেপি নেতারা বলতে শুরু করেছেন, এনআরসি আর সিএএ-র মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।

বিজেপি নেতারা মানুষকে যা-ই বোঝান, বাস্তবে এই আইন কি সত্যিই দেশভাগের শিকার ছিন্নমূল মানুষদের সবাইকে এবং তাঁদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মকে তাঁদের আকাঙ্খিত নাগরিকত্ব দিতে সক্ষম? অমিত শাহরা ঘোষণা করেছিলেন, ওই আইনে তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অ-মুসলিমদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবে সরকার। কিন্তু এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানাচ্ছে, সব শরণার্থী নাগরিকত্ব পাবেন না। প্রতিটি শরণার্থীকে অনলাইনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে। কর্তৃপক্ষ তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। বলা হয়েছে, যাঁরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে পালিয়ে এসেছেন, তাঁদেরই এই সংশোধিত আইনে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। শরণার্থীর আবেদনের সত্যতা বিচার করে দেখবে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং বা 'র' (আবাপ- ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯)। স্বাভাবিক ভাবেই সকলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন, বিজেপি নেতাদের এই দাবি যে আদৌ সত্য নয়, এটা মানুষের কাছে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন উঠছে, দেশের ১৩০ কোটি মানুষকে মোদি-শাহর খাম-খেয়ালে নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে কেন? এতদিন যারা ভোট দিয়ে দেশের সরকার গঠন করেছেন তারা কি দেশের নাগরিক নন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন, না। ভোটারদের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তাঁর বক্তব্য, 'পকেটে ভোটার কার্ড বা আধার যাই থাকুক তা প্রমাণ করবে না আপনি আমি এ দেশের নাগরিক' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-১২-২০১৯)। কিন্তু অমিত শাহর এই বক্তব্য তো দেশের প্রচলিত আইনেরই পরিপন্থী। কারণ, *দি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপল অ্যাক্ট ১৯৫০*-এর ১৬নং ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "এ পারসন শ্যাল বি ডিসকোয়ালিফায়েড ফর রেজিস্ট্রেশন ইন অ্যান ইলেক্টোরাল রোল ইফ হি ইস নট এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া।" অর্থাৎ একজন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক না হলে তার নাম ভোটার লিস্টে উঠবে না। এর অর্থ হল, ভোটার লিস্টে নাম তখনই থাকতে পারে যখন একজন ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। তাই ভোটার কার্ড নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তির নাগরিকত্বের প্রমাণ— দেশের প্রচলিত আইন তাই বলছে। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা একে গায়ের জোরে অস্বীকার করতে পারেন না।

এখন তর্কের খাতিরে যদি অমিত শাহর বক্তব্যকে সঠিক বলে ধরা হয় তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? যারা ভোটার তারা নাগরিক নন, এই যদি মনে করা হয় তবে তো বলতে হবে অনাগরিকদের ভোটে সরকার তৈরি হয়েছে। দেশের সব সরকারই অনাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মোদি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা ভারতের পার্লামেন্ট সবই তো অনাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত। তা হলে অনাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত একটা সরকারই তো বেআইনি। সেই সরকার দেশের নাগরিকত্ব নির্ধারণের আইন তৈরি করছে কীভাবে? তাদের কি সেই অধিকার আছে? আসলে মুসলিম বিদ্বেষে জারিত মন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বৈরাচারী মদমত্ততায় সমগ্র বিষয়টাকে দেখতে গিয়ে মোদি-শাহ জুটি সাধারণ বিচারবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন।

একের পর এক স্ববিরোধী কথা বলছেন বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বলছেন, নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে কোনও কাগজপত্র লাগবে না। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তান থেকে এলেই হিন্দু, শিখ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। অমিত শাহ এ কথা বললেও তাঁর স্বরাষ্ট্র দপ্তর অন্য কথা বলছে। বলেছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের ছ'টি অমুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর শরণার্থী আপনা আপনি ভারতের নাগরিকত্ব পাবে না। একজন শরণার্থীকে অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিচার বিবেচনা করে দেখবেন যে তিনি রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাচারালাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্তাবলি পূরণ করেছেন কি না। (দ্য হিন্দু, ১৭-১২-২০১৯) এই প্রয়োজনীয় শর্তাবলি কী? এই আইনের ৩(২) ধারায় বলা হয়েছে, যে শরণার্থী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন তাঁকে ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ৫নং ধারায় যেসব শর্ত আছে তা পূরণ করতে হবে অথবা ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ার থার্ড সিডিউলে যেসব শর্ত আছে তা পূরণ করতে হবে। ৫নং ধারা অনুযায়ী, একজন শরণার্থীকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আর তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ করতে হবে তিনি বা তার পিতা-মাতার একজনের জন্ম অবিভক্ত ভারতে। এই শর্ত কয়জন শরণার্থী পূরণ করতে পারবেন? এটা কি শরণার্থীদের প্রতি কোনও মানবিক আচরণ?

আর ন্যাচারালাইজেশনের প্রক্রিয়ায় কী শর্ত দেওয়া আছে? সেখানে বলা আছে, যিনি শরণার্থী হিসাবে ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন তাঁকে বলতে হবে, 'যদি তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন গৃহীত হয়, তবে তিনি বর্তমানে যে দেশের নাগরিক সেই দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করবেন।' অর্থাৎ শুরুতেই তাঁকে বলতে হবে যে তিনি বিদেশি এবং তাঁকে তা আদালতে হলফনামা দিয়েই বলতে হবে, মুখে বললে চলবে না বা শুধু লিখে দিলেই হবে না। এইভাবে ঘোষণা করার পর তাঁকে দু'জন ভারতীয় নাগরিক জোগাড় করতে হবে যাঁরা তাঁর চরিত্রের শংসাপত্র দেবেন এবং তাঁকে একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এই মর্মে শংসাপত্র জোগাড় করতে হবে যে, যে কোনও একটা প্রধান ভারতীয় ভাষা তিনি লিখতে বা পড়তে পারেন। পড়তে এবং লিখতে পারার মতো সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা আজও আমাদের দেশে বিস্তর। এই মানুষগুলির কী হবে? তা ছাড়া, এইসব কাগজপত্র জোগাড় করে সরকারি দপ্তরে জমা দেওয়ার পরেই কি তাঁর নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট মিলবে?

না, মিলবে না। কারণ তাঁর দরখাস্ত প্রথমে জমা পড়বে জেলা শাসকের দপ্তরে। তিনি যদি মনে করেন যে আবেদনকারী চরিত্রবান এবং ভারতের নাগরিক হওয়ার যোগ্য তা হলে তিনি সেই দরখাস্ত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন। তারপর সেখানে হবে আর একপ্রস্থ তদন্ত। এই তদন্তে যদি আবেদনকারী উতরে যেতে পারেন তবে তাঁর আবেদন যাবে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় দফতরে। সেখানে আরেক প্রস্থ তদন্ত হবে। সেখানেও যদি তিনি পাশ করতে পারেন তবেই তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিড়বে। তিনি নাগরিকত্ব পাবেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ এবং জটিল। কতদিনে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আইনে নেই। আসামের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ৩ কোটি মানুষের এনআরসি প্রক্রিয়া সরকার ৫ বছরেও শেষ করতে পারেনি। এখানে কোটি কোটি মানুষের আবেদন এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া সরকার রাতারাতি শেষ করে দেবে এই চিন্তা বাতুলতা। ফলে একজন শরণার্থীর আবেদন নিষ্পন্ন করে তার হাতে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট যতদিন সরকার তুলে

চারের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার আদ্রা লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড চিন্ময় সেনগুপ্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৫ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

'৬০-এর দশকে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি রেল কর্মচারী আন্দোলনের নেত্রী কমরেড মালতী চক্রবর্তীর মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। পুরুলিয়া জেলায় কিছুদিন তিনি ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য আরও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দলের কাজে ব্রতী হন। দল তাঁকে যখন যে জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছে তিনি সেই জায়গায় পড়ে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সে সময় পুরুলিয়া জেলায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলেও তারই মধ্যে এলাকায় মেহনতি মানুষের মধ্যে পড়ে থেকে সংগঠনের কাজে লিপ্ত হয়ে বহু ছাত্র-যুবককে দলের সাথে যুক্ত করেন। তিনি এসইউসিআই(সি) দলের তৎকালীন জেলা কমিটির সদস্য হন। তিনি রেলওয়ে কর্মচারী সংগঠনের কাজেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। অসুস্থ থাকার ফলে তিনি দীর্ঘদিন দলের কোনও দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না।

তাঁর মৃত্যুতে দল অতীত দিনের একজন কর্মীকে হারাল। ১৪ ডিসেম্বর আদ্রায় তাঁর স্মৃতিচারণ সভায় দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জী, কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্য।

কমরেড চিন্ময় সেনগুপ্ত লাল সেলাম

মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও অঙ্গ

ভি আই লেনিন

সমস্ত সভ্য দুনিয়ায়, সরকারি ও উদারনৈতিক— উভয় প্রকার বুর্জোয়া বিজ্ঞানের কাছেই মার্কসের শিক্ষা চরম ঘৃণা ও শত্রুতার বিষয়। এরা মনে করে, মার্কসবাদ একটা ক্ষতিকারক বিষাক্ত মতবাদ। এদের কাছে অন্য কোনও মনোভাব আশাও করা যায় না। কারণ, শ্রেণিসংগ্রামকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজে নিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কোনও না কোনও ভাবে, সমস্ত রকমের সরকারি ও উদারনৈতিক বিজ্ঞান মজুরি দাসত্বের পক্ষেই দাঁড়ায়। আর মার্কসবাদ এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত কি না— এই প্রশ্নে মালিকের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা যেমন আশা করা যায় না, তেমনি মজুরি দাসত্বের সমাজেও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের আশা করা নির্বোধ সারল্য ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এটাই সব নয়। দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাস একেবারে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে, মার্কসবাদে এমন কিছু নেই, যাকে বলা যাবে 'সংকীর্ণতাবাদ'। কথাটা এই অর্থে বুঝতে হবে যে, মার্কসবাদ কোনও গোঁড়া, নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল মতবাদ নয়, এ এমন কোনও মতবাদ নয়— বিশ্বসভ্যতার বিকাশের রাজপথ থেকে অনেক দূরে যার সৃষ্টি হয়েছে। বরং মার্কসের প্রতিভা এটাই যে, মানবসমাজের সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তাবিদরা যে সব প্রশ্ন আগেই তুলে গিয়েছিলেন, মার্কস সে সবের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, এবং সমাজতন্ত্রের মহান চিন্তানায়কদের শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই মার্কসের মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। সর্বব্যাপক ও সুসমঞ্জস এই দর্শন মানুষকে দেয় একটি অখণ্ড বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যা কোনও ধরনের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া বা বুর্জোয়া নিপীড়নের সাথে কোনও রকম আপস করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যা মূর্ত হয়েছে জার্মান দর্শন, ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও ফরাসি সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে— মার্কসবাদ তার ন্যায্য উত্তরসূরী। মার্কসবাদের এই তিনটি উৎস, যেগুলি তার গঠনকারী উপাদানও বটে— সে সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(১)

মার্কসবাদের দর্শন হল বস্তুবাদ। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র পর্যায় জুড়ে এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে, যেখানে— সমস্ত ধরনের মধ্যযুগীয় বস্তাপচা চিন্তার বিরুদ্ধে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদ্যমান ভূমিদাসত্ব ও ধ্যানধারণায় টিকে থাকা তার প্রভাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল— সেখানে বস্তুবাদই হল একমাত্র দর্শন যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সেগুলির প্রতি অনুগত থেকেছে এবং কুসংস্কার ও ধর্মের নামে ভণ্ডামি ইত্যাদির বিরোধিতা করেছে। এই কারণে গণতন্ত্রের শত্রুরা সর্বদা বস্তুবাদকে 'ভুল প্রতিপন্ন করার', তাকে লঘু ও হেয় করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে এবং নানা রূপের দার্শনিক ভাববাদ প্রচার করেছে যা বাস্তবে কোনও না কোনও ভাবে সর্বদা ধর্মেরই সাফাই বা সমর্থনে পরিণত হয়েছে।

সমস্ত রকম নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিগুলির পিছনে সবসময় কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থই যে কাজ করে, এই সত্য আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত জনসাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদা প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ শিকার হয়েছে এবং চিরকাল তাই হতে থাকবে।

মার্কস-এঙ্গেলস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং বারবার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, এই ভিত্তি থেকে প্রতিটি বিচ্যুতিই কী গুরুতর ভুল। তাঁদের অভিমতগুলি সব থেকে পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে এঙ্গেলস-এর রচনা 'লুডউইগ ফুয়েরবাখ' ও 'অ্যান্টি ডুরিং'-এ যা কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মতোই প্রতিটি শ্রেণিসচেতন শ্রমিকের নিত্যপাঠ্য।

কিন্তু মার্কস অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদেই থেমে যাননি। তিনি দর্শনকে আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করেছেন, তাকে জার্মান ধ্রুপদী দর্শন, বিশেষত হেগেলের দর্শনশাস্ত্রের সাফল্যগুলির দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যে হেগেলীয় দর্শন আবার উন্নীত হয়েছিল ফুয়েরবাখের বস্তুবাদে। এই অর্জিত সাফল্যগুলির মধ্যে প্রধান হল দ্বন্দ্বতত্ত্ব (ডায়ালেকটিক্স), যা বিকাশকে পূর্ণতম, গভীরতম ও সর্বাপেক্ষা সর্বাঙ্গীন রূপে উপলব্ধি করার মতবাদ। যে মতবাদ তুলে ধরে, মানুষের জ্ঞান হল আপেক্ষিক, যার মধ্যে বিকাশমান বস্তুজগতের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বুর্জোয়া দার্শনিকদের পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু ভাববাদী শিক্ষাগুলির 'নতুন' ব্যাখ্যা সত্ত্বেও রেডিয়াম, ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সহ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সত্যতাকেই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে।

মার্কস দার্শনিক বস্তুবাদকে পূর্ণ বিকশিত ও তার উপলব্ধিকে গভীরতর করেছেন, প্রকৃতিজগত সম্পর্কে জ্ঞানকে প্রসারিত করে তার মধ্যে মানবসমাজ সংক্রান্ত জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক মহান কীর্তি। ইতিপূর্বে ইতিহাস ও রাজনীতি বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়ালি চিন্তার যে প্রাবল্য ছিল, তাকে অপসারিত করে একটি সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস অপূর্ব বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হল, যা দেখাল কীভাবে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের ফল হিসাবে এক ধরনের সমাজব্যবস্থা থেকে উচ্চতর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। সামন্তী ব্যবস্থার মধ্য থেকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটা যার উদাহরণ।

মানুষের জ্ঞান যেমন প্রতিফলিত করে প্রকৃতিজগতকে (যা আসলে বিকাশমান বস্তুজগৎ), যা মানুষের চেতনা নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে, ঠিক তেমনই মানুষের সামাজিক জ্ঞান (অর্থাৎ, মানুষের দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা মতামত ও তত্ত্ব) প্রতিফলিত করে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক ভিত্তিরই একটি উপরিকাঠামো। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক রূপ যে ধরনের হোক না কেন, সেগুলি সর্বহারাদের উপর বুর্জোয়াদের আধিপত্য জোরদার করার জন্যই কাজ করছে।

মার্কসের দর্শন হচ্ছে একটি সুসম্পূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ যা মানবজাতিকে, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণিকে জ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ার জুগিয়েছে।

(২)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ভিত্তি, যার উপর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো তৈরি হয়— এই সত্যোপলব্ধির পর মার্কস অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের জন্য গভীরতম সাধনায় ব্রতী হন। মার্কসের প্রধান রচনা, 'পুঁজি' (ক্যাপিটাল) নিয়োজিত হয়েছে আধুনিক, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির পর্যালোচনায়।

মার্কসের পূর্বেকার ধ্রুপদী রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত দেশ ইংল্যান্ডে। অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অনুসন্ধান চালিয়ে 'শ্রমের মূল্যতত্ত্ব' (লেবার থিওরি অফ ভ্যালু)-র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মার্কস তাঁদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান, তিনি ওই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন এবং ধারাবাহিকভাবে তার বিকাশ ঘটান। তিনি দেখান যে, কোনও পণ্য উৎপাদন করতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ শ্রমসময় ব্যয় করা হয়, তার দ্বারাই প্রতিটি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা দেখেছিলেন দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক (একটি পণ্যের বিনিময়ে অন্য পণ্য), মার্কস সে জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন মানুষে মানুষে সম্পর্ক। পণ্যের বিনিময় ব্যবস্থা বাজারের মাধ্যমে এক একজন উৎপাদকের সঙ্গে অপরাপর উৎপাদকের সংযোগকে প্রকাশ করে। মুদ্রার ব্যবহার দেখায় যে, এই সংযোগ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, তা প্রতিটি উৎপাদকের সমগ্র আর্থিক জীবনকে একটি অখণ্ড সত্তার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে দিচ্ছে। এই সংযোগেরই আরও বিকাশ সূচিত করছে পুঁজি। মানুষের শ্রমশক্তি পরিণত হচ্ছে পণ্যে। জমি, কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারগুলির মালিকের কাছে মজুরি-শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করছে। দিনের একটি অংশে শ্রমিক খাটছে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় (মজুরি) উপার্জন করার জন্য। দিনের বাকি অংশের কাজের জন্য কোনও মজুরি সে পায় না। এই অংশের শ্রমের দ্বারা সে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করছে— যে উদ্বৃত্ত মূল্যই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা ও সম্পদের উৎস।

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব হচ্ছে মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল ভিত্তিপ্রস্তর।

পুঁজি তৈরি হয় শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা। আবার সেই পুঁজিই ছোট উৎপাদকদের ধ্বংসসাধন ও বিশাল বেকারবাহিনী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে শ্রমিককে পিষ্ট করে। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার বিজয়ের ফল তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। কিন্তু একই জিনিস কৃষির ক্ষেত্রেও ঘটতে দেখা যাবে। সেখানেও বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষির প্রাধান্য বাড়ছে, যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে এবং কৃষি-অর্থনীতির পুরনো ধাঁচা মুদ্রা-পুঁজির ফাঁদে আটকা পড়ে ডুবছে, তা পিছিয়ে পড়া উৎপাদনপ্রণালীর বোঝার চাপে ভেঙে পড়ছে। ক্ষুদ্র উৎপাদনের ভাঙন কৃষিতে ভিন্ন রূপে ঘটছে, কিন্তু ভাঙন যে ঘটছে, তা একটি অনস্বীকার্য ঘটনা।

পুঁজি ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের জোটগুলির জন্য একটি একচেটিয়া অবস্থান তৈরি করে দেয়। উৎপাদনটাই ক্রমে অধিকতর হারে সামাজিক চরিত্র নেয়— হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জীবদেহের অবিচ্ছেদ্য অংশের মতো একসাথে বাঁধা পড়ে যায়। কিন্তু এই যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্য উন্মত্ত প্রতিযোগিতা এবং ব্যাপক জনসমষ্টির অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

পুঁজির উপর শ্রমিকদের নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঐক্যবদ্ধ শ্রমের এক বিশাল ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

মার্কস দেখিয়েছেন সেই পথের দিশা, যার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ পণ্য অর্থনীতির ভ্রূণাবস্থা থেকে সরল বিনিময় ব্যবস্থা পার করে পৌঁছেছে তার উচ্চতম রূপ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায়। বিশ্বের পুরনো ও নতুন সকল পুঁজিবাদী দেশের বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় শ্রমিকদের কাছে মার্কসীয় মতবাদের সত্যতা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছে।

বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ জয় শুধু পুঁজির উপর শ্রমের বিজয়লাভের আগমনী গান।

(৩)

সামন্ততন্ত্র যখন উৎখাত হল এবং বিশ্বে 'স্বাধীন' পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটল, তখনই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই স্বাধীনতা আসলে শ্রমজীবী জনগণের উপর অত্যাচার ও শোষণের একটি নতুন ব্যবস্থা। এই অত্যাচার ও শোষণের প্রতিফলন ও প্রতিবাদ স্বরূপ নানা ধরনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অবিলম্বে দেখা দিতে শুরু করে। প্রথম দিককার সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য ছিল কাল্পনিক সমাজতন্ত্র। তা পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছেন, অভিশাপ দিয়েছে, তার ধ্বংসের স্বপ্ন দেখেছে, উন্নততর এক ব্যবস্থার কল্পনায় মেতেছে এবং ধনীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, শোষণ করা অনৈতিক কাজ।

কিন্তু কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রকৃত সমাধানের পথ দেখাতে পারেনি। তা পুঁজিবাদী সমাজের মজুরি-দাসত্বের প্রকৃত চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারেনি, পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মগুলি কী তা-ও আবিষ্কার করতে পারেনি এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে কাকোরি-শহিদ স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী, কাকোরি মামলায় শহিদ রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লা খানের আত্মদান দিবস ১৯ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয় রাজস্থানের পিলানিতে।

▲ পিলানি, রাজস্থান

◀ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

▼ আগরতলা, ত্রিপুরা

এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-যুব নেতারা বলেন, এই দুই শহিদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে অনন্য নজির রেখে গেছেন, তা আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। সরকার জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান না করে উল্টে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে এনআরসি এবং সিএএ চালু করছে, বক্তারা তার তীব্র নিন্দা করেন।

বিদ্যুৎ সংযোগ চাই ঃ হাইলাকান্দিতে কৃষক বিক্ষোভ

৩০ নভেম্বর আসামের হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর বর্ণীব্রিজ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের হাইলাকান্দি শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। পরে এপিডিসিএল-এর সাব ডিভিশনাল ম্যানেজারকে স্মারকপত্র দেওয়া হয়। প্ল্যাকার্ড ব্যানারে সুজ্জিত ও স্লোগান মুখরিত এই মিছিল সিরাজপট্টি থেকে নানা রাস্তা ঘুরে এপিডিসিএল কার্যালয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকপত্র তুলে দেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক প্রদীপ সরকার।

স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়, স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও এ অঞ্চলের জনগণ বিদ্যুতের মতো আধুনিক জীবনযাত্রার ন্যূনতম সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। তাই দ্রুত হাইলাকান্দি শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জকিরতল-বাকালালা-বড়দোয়াল-বেড়িদেওয়াল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ করার দাবি জানানো হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এর পর পথসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সংগঠক প্রভাস চন্দ্র সরকার। এই আন্দোলনে অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন আফজল হুসেন মজুমদার, শংকর গোয়ালা, শেখ শুক্কুর আলি, রঞ্জু চন্দ্র দাস প্রমুখ।

কলম্বিয়ায় নির্মম পুলিশি হামলা উপেক্ষা করে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক জনবিক্ষোভের। ২১ নভেম্বর থেকে শুরু করে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছেন কলম্বিয়ার মানুষ। দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট ইভান দুকিউয়ের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সেখানকার শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, মডেল, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে কলম্বিয়ার ছাত্রসমাজ। দেশ জুড়ে রাস্তায় রাস্তায়, চক-চৌরাস্তার মোড়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ খালি হাতে, ঘর থেকে বাসনপত্র নিয়ে বাজাতে বাজাতে কিংবা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে সামিল হয়েছেন বিক্ষোভে।

কেন তাঁরা রাজপথে? নয়া-উদারবাদী নীতির অনুগামী প্রেসিডেন্টের তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের ধাক্কায় এমনিতেই মানুষের জীবনে গরিবি-বেকারির দুর্দশা বেড়েছে। এর ওপর বছর শেষ হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট দেশের কর-কাঠামোর পরিবর্তন করতে চলেছেন। তাঁর সরকার কর্পোরেট পুঁজিপতিদের বিপুল কর ছাড় দিতে চায়, সুবিধা পাইয়ে দিতে চায় দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের। ফলস্বরূপ আরও ব্যাপক হবে মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য। হাতে গোনা পুঁজিমালিকদের স্বার্থে প্রেসিডেন্ট দুকিউ সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষুব্ধ কলম্বিয়ার মানুষ সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে। গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও গণসংগঠনের প্ল্যাটফর্ম 'ন্যাশনাল স্ট্রাইক কমিটি'। পাশাপাশি, তাঁরা চান সামাজিক আন্দোলনের অধিকার। কলম্বিয়া এমন একটি দেশ যেখানে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন কোনও নতুন কথা নয়। আন্দোলনকারীদের হামেশাই খুন বা অত্যাচারের শিকার হতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই অপহরণের মতো ঘটনাও ঘটে। সেখানে আছে কুখ্যাত এক পুলিশবাহিনী— 'মোবাইল অ্যান্টি-ডিস্টারবেন্সেস স্কোয়াড্রন', স্প্যানিশ ভাষায় আদ্যক্ষর নিয়ে যার নাম 'ইএসএমএডি'। এই বাহিনী বাতিল করার দাবি উঠেছে বিক্ষোভে। পাশাপাশি ছাত্রসমাজের দাবি, প্রতিশ্রুতিমতো প্রেসিডেন্টকে উচ্চশিক্ষায় সরকারি খরচ বাড়াতে হবে।

২১ নভেম্বর বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর পরই কলম্বিয়ার পুলিশ নির্মম হাতে আন্দোলন দমনে নেমে পড়ে। ২৩ নভেম্বর ১৮ বছরের এক বিক্ষোভকারী ছাত্রের মৃত্যু হয়। উত্তাল হয়ে ওঠে আন্দোলন। পুলিশের নির্মম হামলা উপেক্ষা করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে রাস্তায় নেমে লাগাতার বিক্ষোভ দেখান কলম্বিয়ার মানুষ। গত ১০ ডিসেম্বর রাতে কলম্বিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশ বর্বর হামলা চালায়। দু'জন ছাত্রকে অপহরণ করে পুলিশের দালালরা গাড়িতে তুলে নেয়। আন্দোলনকারীরা গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে ঘটনার ছবি তুলে রাখেন। শেষ পর্যন্ত একজন ছাত্রকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন আন্দোলনকারীরা। মানবাধিকার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী লাগাতার এই বিক্ষোভে চারশোরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন হাজারেরও বেশি। গত ১৬ ডিসেম্বরও দেশ জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দেয় স্ট্রাইক কমিটি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিয়ে হামলা চালায় পুলিশ। দাবি আদায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ন্যাশনাল স্ট্রাইক কমিটি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এক বিক্ষোভকারী জানিয়েছেন, শুরুতে সরকারবিরোধী ক্ষোভ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ জড়ো হয়েছিলেন আন্দোলনে। কিন্তু যত দিন গেছে, ততই সংগঠিত হয়েছেন তাঁরা। এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গড়ে তুলেছেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে কলম্বিয়ার মানুষের পক্ষে। বাস্তবে অত্যাচারী শাসকের কাছ থেকে দাবি আদায়ের একমাত্র পথ সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে অসংখ্য গণকমিটি গড়ে তুলে দেশজোড়া আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করা। কলম্বিয়ার সংগ্রামী মানুষ সেই পথ ধরেই চলেছেন।

মোদি-শাহরা মিথ্যাচারের রাস্তা নিয়েছেন

দুয়ের পাতার পর

দিতে না পারবেন ততদিন তাকে নাগরিক অধিকারহীন হয়েই থাকতে হবে। আবার এই প্রক্রিয়ায় আপনি নাগরিকত্ব পাবেনই তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তদন্তের যে-কোনও পর্যায়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে আবেদনকারী নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য নন, তবে তাঁর কিছু করার থাকবে না। তিনি নাগরিকত্ব পাবেন না। বাদবাকি জীবনটা তাকে অনাগরিক হয়েই থাকতে হবে। তাই, এই সমগ্র পর্যায়ে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য নানা স্তরের সরকারি কর্তাদের মন জুগিয়ে শরণার্থীদের চলতে হবে।

বিজেপির হিসাব হল কোটি কোটি মানুষ আবেদন করার পর তা ঝাড়াই বাছাই করতে করতেই তো কয়েক বছর কেটে যাবে এবং ততদিন পর্যন্ত যারা আবেদন করবে তারা একেবারে বিজেপির পকেটে চলে যাবে, বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করবে। বিশেষ করে ওদের লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। ওরা মনে করছে, এর ফলে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষজন বিজেপিকে ধন্য ধন্য করবে এবং আগামী নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাদের একেবারে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসিয়ে দেবে। কিন্তু বিজেপি'র এই পরিকল্পনা সফল হবে না। কারণ, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষজন নিজেদের বিদেশি বলে ঘোষণা করবেন না, নিজেদের বিজেপি ও সরকারি কর্মকর্তাদের করুণার পাত্রে পরিণত করবেন না। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ, ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের জোয়ার সেটাই প্রমাণ করে। ফলে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাঁরা দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে বসবাস করছেন, ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার ভোগ করছেন তাঁদের কাছে বিজেপির ষড়যন্ত্র ক্রমাগত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই বিজেপির পরিকল্পনা মতো তাঁরা যে নতুন আইন অনুযায়ী আবেদন করবেন না, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং এইভাবেই তাঁরা বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্তকে প্রতিহত করবেন।

দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে। কিন্তু বিজেপি একটি সংগঠিত দল এবং অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিকই উগ্র হিন্দুত্বের আবেগ উস্কে দিয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে নেমেছে। ফলে এর মোকাবিলা শুধু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হতে পারে না। এর জন্য প্রতিবাদীদেরও অত্যন্ত সংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল হতে হবে। আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে গড়ে তুলতে এলাকায় এলাকায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনকে স্বাভাবিকভাবেই ভোটবাজ দলগুলি ভোটরাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইবে। প্রতিবাদী মানুষকে সচেতন থাকতে হবে যাতে তাঁরা তার শিকার না হন। কমিটির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আন্দোলনগুলিতে সচেতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নির্ভয়া দিবসে নারী সুরক্ষার শপথ

১৬ ডিসেম্বর 'নির্ভয়া দিবসে' নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সভা অনুষ্ঠিত হয় (উপরের ছবি)। প্রতিবাদী সঙ্গীত, কোরিওগ্রাফি, আবৃত্তির কোলাজ, পথনাটক এবং বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। হাওড়া নাট্যমঞ্চ, সোনারপুর মনীষা গোষ্ঠী পথনাটকের মধ্য দিয়ে পণপ্রথা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রূপশ্রী কাহালি ও তাঁর ছাত্রীরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ছাত্রীদের একটি গ্রুপ এবং শর্মিষ্ঠা রায় নৃত্য কোরিওগ্রাফির মধ্য দিয়ে নারী শক্তির জয় ঘোষণা করেন। সৃজনী, অগ্নিবীণা এবং সাম্পান গোষ্ঠী সঙ্গীতের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, কমিটির সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র কুমার গুপ্ত।

ওই দিন আগরতলায় এআইএমএসএস, ডিওয়াইও, ডিএসও-র উদ্যোগে নির্ভয়া দিবস পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস শিবানী ভৌমিক, ভবতোষ দে ও মৃদুলকান্তি সরকার।

নদীতে অবরোধ করে কুলতলী বিট অফিস ঘেরাও

১৮ ডিসেম্বর ৩ শতাধিক নৌকা নিয়ে ৪ সহস্রাধিক মৎস্যজীবী দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী চিতড়ি ফরেস্ট ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জয়নগরের সিআই, কুলতলী ও মৈপীঠের ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী দুটি লঞ্চ নিয়ে এলে তারাও প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে।

সন্তান সহ বহু মা অবরোধে যোগ দেন। তাঁদের দাবি বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে মাছ-কাঁকড়া ধরা বন্ধ করা যাবে না, বনদপ্তর ও টাইগার প্রজেক্টের কর্মীদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম ফেরত দিতে হবে, আটকে রাখা জাল-নৌকা ফেরত দিতে হবে, বনদপ্তরের অফিসারদের ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে হবে, ইত্যাদি। সকাল থেকে শুরু করে সারা দিন ঘেরাও চলে।

রাত ৮ টা নাগাদ এডিএফও আলিপুর সেখানে পৌঁছান এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁরা দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নেন ও সিদ্ধান্ত হয়, যেভাবে মাছ-কাঁকড়া ধরা চলছে, সেভাবেই চলবে। যে খাঁড়িতে জল শুকিয়ে যায় সেখানে যন্ত্রচালিত নৌকা চলবে না, বাকি সব ছোট-বড় নদীতে যন্ত্রচালিত নৌকা চলবে, আটক রাখা জাল-নৌকা ফেরত দেওয়া হবে।

আন্দোলনের এই জয়ে জয়কৃষ্ণ হালদার মৎস্যজীবীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কৃষক বিক্ষোভ

অনাবৃষ্টির দরুণ চাষিদের ক্ষতিপূরণ, সেচের ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজ, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা, খাস জমির উপর আদিবাসীদের পাট্টা সহ ১১ দফা দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ১৯ ডিসেম্বর দেড় শতাধিক কৃষক এ আই কে কে এম এসের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা কমরেডস দনা গোস্বামী ও প্রভাতী গোস্বামী। উপপ্রধান দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং কিছু দাবি মেনে নেন।

সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতির দাবি মিড-ডে মিল কর্মীদের

মিড-ডে মিল প্রকল্প বন্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে, মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা সহ ১৩ দফা দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর রাজভবন অভিযান সফল করার জন্য ২০ ডিসেম্বর হাওড়ার বাগনান অঞ্চলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল ইউনিয়নের খালনা অঞ্চলের সংগঠক ব্রততী পাল ও সহ-সভাপতি নিখিল বেরা।

সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, ২১ হাজার টাকা ন্যূনতম বেতন সহ নানা দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর হরিয়ানার মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভিওয়ানিতে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এ আই কে কে এম এস-এর অশোকনগর জেলা সম্মেলন

এ আই কে কে এম এসের উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের অশোকনগর জেলা কৃষক ও খেত মজদুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ নভেম্বর। ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষি ঋণ মকুব, কৃষিতে ভরতুকি প্রদান প্রভৃতি দাবিতে ছিল এই সম্মেলন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যে রাজ্যে কৃষক আন্দোলনে যেভাবে লাঠিগুলি চালিয়েছে সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্তমানে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা সরেকারের সহযোগিতায় কীভাবে চাষিদের শোষণ করছে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মনীশ শ্রীবাস্তব।

বেলদা-হাওড়া লোকাল বাঁচাও কমিটির অবস্থান

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা-কেশিয়াড়ি ৫ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর রেল গেটে ওভারব্রিজের দাবিতে ১১ ডিসেম্বর গণ অবস্থান করে বেলদা-হাওড়া লোকাল বাঁচাও এবং যাত্রী সুরক্ষা কমিটি। কমিটি এলাকার সাংসদ থেকে বিধায়ক, ডি আরএম, ডি এম সবার কাছেই দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছে। এ দিন গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। কমিটির পক্ষে রামলাল রাঠি, তুষার জানা, বিদ্যাভূষণ দে জানান, দাবি পূরণ না হলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্তদের কম্বল বিতরণ

১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে ঘোড়াদল হাইস্কুলে বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থদের মধ্যে দেড় শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সহ সভাপতি ডাক্তার বিজ্ঞান বেরা এবং স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকরা।

নন্দীগ্রামে মহিলা সম্মেলন

১৬ ডিসেম্বর নির্ভয়া দিবসে নারী-শিশু নির্যাতন ও নারীপাচার বন্ধ করা, মদ নিষিদ্ধ করা, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি বন্ধ করা, শিশু ও নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সমকাজে সমবেতনের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নন্দীগ্রাম থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা রীতা প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য শ্রাবণী পাহাড়ী। সম্মেলন শেষে রাধা মাজীকে সভানেত্রী এবং অনুরাধা মাইতি ও খুকুমণি দাসকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ২৭ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

পাঠকের মতামত

হাততালি কম কেন?

সংবাদে প্রকাশ, ২০ ডিসেম্বর বণিকসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 'হাততালি কম কেন' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে ক্ষোভের কারণ এনআরসি ও সিএএ চালুর জন্য নয়, যা সারা দেশের নাগরিকরা দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভের কারণ তাঁর বক্তৃতা শোনার পর জোরে জোরে হাততালি দেননি ভারতের অন্যতম বৃহৎ বণিকসভা অ্যাসোচেমের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা। অবশ্য কেন শিল্পপতিদের বেশি হাততালি দেওয়া উচিত, তাও তিনি প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়েছেন। সাবাস, এই না হলে প্রধানমন্ত্রী! একমাত্র তাঁদের শাসন কালেই কর্পোরেট ট্যাক্স সর্বনিম্ন, এই সরকার সর্বক্ষেত্রেই সফল এবং আরও বলেছেন, তাঁরা কর্পোরেটের বন্ধু আবার ব্যবসায়ীদেরও সাহায্যকারী। যাদের জন্য এত কিছু করছেন তারাই তাঁকে বুঝছেন না?

সরকার সর্বক্ষেত্রে কতটা সফল সেই বিষয়ে আসা যাক। ক্ষমতায় আসার আগে যে সব প্রতিশ্রুতি জনগণকে প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেগুলি স্মরণ করি। বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছভারত, মূল্যবৃদ্ধি হবে না, জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হবে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় বসেই ডিমানিটাইজেশন করে বলেছিলেন, কালো টাকা উদ্ধার হবে, জাল নোট ছাপা বন্ধ হবে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হবে। জনধন যোজনা অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে। এর কোনওটিই হয়নি। নতুন ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, আচ্ছে দিন স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত। ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস বিনামূল্যে, বিনামূল্যে চিকিৎসার হেলথ কার্ড বাস্তবে সবই টাকা দিয়েই নিতে হচ্ছে, ভরতুকি তলানিতে গেছে। গ্যাসের দাম প্রচুর বেড়েছে। সাধারণ মানুষ যাঁরা ভোটের আগে প্রচুর হাততালি দিয়েছিলেন তাঁরা দেখছেন, এগুলি সবই 'জুমলা'।

২০১৯-এ ক্ষমতায় বসেই তাদের ঝুলি থেকে বেড়াল বের হচ্ছে। একদিকে তীব্র আর্থিক আক্রমণ, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র অন্যদিকে ৩৭০ ধারা বাতিল, রামমন্দির নির্মাণ, এনআরসি-সিএএ চালু, বিমান-রেল-ডাক-তার-বিমা-সড়ক-সেতু-শিক্ষা-চিকিৎসা সবকিছু বেসরকারিকরণের ছক যেগুলি পর্দার আড়ালে ছিল, এখন দাঁত ও নখ বের করছে। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের কথা বলতে বলতেই তাদের সর্বস্বান্ত করছে। জিএসটি থেকে আদায়ীকৃত অর্থ লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর্পোরেটদের ছাড় দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বিজয় মাল্য-ললিত মোদি-নীরব মোদি-মেহুল চোক্সীদের দেশের বাইরে যেতে সাহায্য করেছে। ব্যাঙ্কের ঘাটতি মেটাতে সরকারিভাবে আদায়ীকৃত টাকা জনগণের ঘাড় মটকে উপঢৌকন দিচ্ছে। এমনকী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাঁড়ারেও হাত দিয়েছে। শিল্পপতিদের ঋণ মকুব করছে। ফলে ভোট মিটতে মোদি সাহেব এখন জনগণকে ছেড়ে শিল্পপতিদের হাততালিরই প্রত্যাশী। কম পড়লে রাগ তো করবেনই!

বিদ্যুৎ সীট, জগদল্লা, বাঁকুড়া

শিশুদের পুষ্টিতে নয় পুঁজিপতি-ত্রাণেই দায়বদ্ধ সরকার

এ দেশে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার ৩৪ শতাংশ, পাঁচ বছরের কমবয়সীদের ক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ এবং শতকরা ২৫ জন সদ্যোজাত শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মূল কারণ মা ও শিশুর অপুষ্টি। শিশুদের ৫৯.৭ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৪.৪ শতাংশ অপুষ্টিজনিত কারণে রক্তাল্পতার শিকার। শিশুরাই সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক। স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ-সবল শরীর ও মনের অধিকারী শিশু জাতির বিকাশের পক্ষে সহায়ক। আবার সুস্থ মা-ই সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুধা সূচকে যে ভারতের স্থান ১১৯ টি দেশের মধ্যে ১০২তম, সেই দেশে মায়েরা-শিশুরা যে সুস্থ থাকতে পারে না, তা বোঝার জন্য আর কোনও পরিসংখ্যানের দরকার হয় না।

স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরে ১৯৭৪ সালে একটা জাতীয় শিশুনীতি ঘোষণা করা হল। শিশুর জন্মের আগে থেকেই অর্থাৎ শিশু যখন মাতৃজঠরে তখন থেকে শিশুর গড়ে ওঠার কাল (ছয় বছর) পর্যন্ত সুসংহতভাবে মা ও শিশুর পরিচর্যা ও দেখভালের জন্য ১৯৭৫ সালে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। নাম দেওয়া হল 'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস'— অর্থাৎ 'সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প'। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ঘোষণার তিন বছর পরেই সে ভাবনার মৃত্যু হয়। ১৯৭৮ সালে জনতা পার্টির সরকার এটা বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার ১৯৯৫ সালে দশম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই 'আইসিডিএস' প্রকল্পকে কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।

এর ফলে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার গড়ে তোলা হয়। এই সেন্টারে একজন কর্মী তথা সেবিকা ও একজন সহায়িকা থাকেন। তাঁদের কর্তব্যের তালিকায় রয়েছে একটি নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মা ও শিশুদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের দেখভাল করা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে মায়েদের সচেতন করা, প্রয়োজনে আশা কর্মীদের সাহায্য করা, বাড়ি বাড়ি যাওয়া, শিশুদের প্রাক বিদ্যালয় পড়া ও খেলাধূলা করানো, এ ছাড়াও ব্লকে রিপোর্ট করা, হিসেব রাখা ইত্যাদি। এতসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও এঁরা কিন্তু সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃত নন। তাই এঁদের ন্যূনতম বেতনও জোটে না। সাম্মানিক হিসাবে সামান্য কিছু টাকার সাথে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কিছু অনুদান যুক্ত হয়। সেন্টারগুলি চালাতে বরাদ্দ খাদ্য সামগ্রী—চাল, ডাল ও ডিম নিয়মিত আসে না। জ্বালানি, সব্জি, মশলা সেবিকাদেরই খরচ করে সুপারভাইজারের মাধ্যমে বিল পাঠাতে হয়। টাকা পেতে দেরি হয়। এই প্রকল্প নিয়ে বড় বড় কথা সরকার যতই বলুক, এর প্রতি পদক্ষেপে সরকারি অবহেলা, সদিচ্ছার অভাব আর দুর্নীতির ছাপ স্পষ্ট। আর্থিক শোষণে জর্জরিত দেশের নিরন্ন মানুষের কাছে রাষ্ট্রের একটা মানবিক মুখ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে স্কুলের মিড-ডে মিল, পোষণ অভিযান (রাজস্থান) ইত্যাদি চালু হলেও আসলে সরকার এগুলিকে কী দৃষ্টিতে দেখে তা বরাদ্দের পরিমাণ দেখলেই মালুম হয়। মিড-ডে মিলে ছাত্র পিছু দৈনিক বরাদ্দ প্রাথমিকে ৪.৪৮ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৬.৭১ টাকা।

গত পাঁচ বছরে প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে ১৩ শতাংশ। আর যাঁরা দৈনিক প্রায় আট ঘণ্টা হাড়ভাঙা শ্রম দিয়ে বাজার করা, রান্না করা, পরিবেশন করা এবং পরিশেষে ধোওয়া-ধুয়ি করে এই প্রকল্পটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, সেই রাঁধুনি পান মাসে মাত্র ১০০০ টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্র দেয় ৬০০ টাকা, বাকিটা দেয় রাজ্য। আবার এই 'সাম্মানিক' টাকাটাও তাঁরা পেতেন বছরে দশ মাসের জন্য। সম্প্রতি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ১২ মাসই এই সাম্মানিক অর্থ দেওয়ার কথা বলেছে।

অপুষ্টির মূল কারণ দারিদ্র। গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের সারা বছর কাজ থাকে না। ফলে খাবারও জোটে না। গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প তৈরি হয়েছিল। দুর্নীতি ও বরাদ্দের স্বল্পতায় এই প্রকল্পটিও প্রচারেই থেকে গেল। মানুষের হাতে দু'বেলা পেট ভরে খাবার পয়সা এল না। এইভাবেই সামগ্রিক দিক থেকে অপুষ্টি দূরীকরণে সরকারের প্রকল্পগুলির ঢক্কা নিনাদ শূন্য কলসির আওয়াজের মতোই বেজে যাচ্ছে।

এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে সরকারের কার্পণ্য থাকলেও, সাম্প্রতিক আর্থিক মন্দায় মুষ্টিমেয় বৃহৎ শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের ১.৪৪ কোটি টাকা কর ছাড় দিয়ে দিল। অথচ এই টাকার অর্ধেক পরিমাণ টাকায় ১০০ দিনের প্রকল্পকে দ্বিগুণ করা যেত, এর মাত্র পঁচিশ শতাংশ টাকা দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি এবং মিড-ডে মিল প্রকল্প দু'টিকে দ্বিগুণ করা যেত। ভারতের ৪০,০০০ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ৮০,০০০ সেবিকা ও সহায়িকা এবং ৪৮ লক্ষ মা ও ২ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু, মিড-ডে মিলের ২৫ লক্ষ কর্মী আর এ দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীদের জড়িত করে যে সামাজিক প্রকল্পগুলি বিরাট এক পরিসরে কাজ করে, তাদের যথার্থ উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের চিন্তার চেয়ে সরকারের কাছে বেশি জরুরি পুঁজিপতিদের স্বার্থ। তাই এই সমস্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত শ্রমজীবী মহিলারা আজ এই প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে রাস্তায় নেমেছেন। এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি শিশু ও মায়ের বাঁচার অধিকার।

মার্কসবাদের তিনটি উৎস

তিনের পাতার পর

কোন সে সামাজিক শক্তি যা নতুন সমাজ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে— তা-ও নির্দেশ করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে সামন্ততন্ত্র, ভূমিদাসত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে যেসব উত্তাল বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সমাজের শ্রেণিগুলির মধ্যকার সংগ্রামই হচ্ছে সকল বিকাশের মূল ভিত্তি ও চালিকাশক্তি।

সামন্ত শ্রেণিকে পরাজিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনও একটি বিজয়ও মরণপণ প্রতিরোধের মোকাবিলা না করে অর্জন করা যায়নি। পুঁজিবাদী সমাজের নানা শ্রেণিগুলির মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম ছাড়া কম-বেশি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভিত্তি নিয়ে কোনও পুঁজিবাদী দেশই দাঁড়াতে পারেনি।

মার্কসের প্রতিভা এখানেই যে, এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের যে শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে সর্বপ্রথম তিনিই সিদ্ধান্তের আকারে তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং তা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করেন। মার্কসের এই সিদ্ধান্তই হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামের মতবাদ।

সমস্ত রকম নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিগুলির পিছনে সবসময় কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থই যে কাজ করে, এই সত্য আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত জনসাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদা প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ শিকার হয়েছে এবং চিরকাল তাই হতে থাকবে। সংস্কার ও উন্নয়নের চ্যাম্পিয়নরা পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকদের হাতে ততদিন বোকা বনে যাবেন, যতদিন না তাঁরা বুঝবেন যে, প্রতিটি পুরনো প্রতিষ্ঠান তা যত বর্বর ও ক্ষয়িষ্ণুই হোক না কেন, তাকে কোনও না কোনও শাসক শ্রেণির শক্তিই টিকিয়ে রেখেছে। এবং ওই শাসক শ্রেণিগুলির বাধা চূর্ণ করার একটাই পথ, তা হল আমাদের সমাজের মধ্যকার যে শক্তিগুলি তাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থানের কারণে পুরনো ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করার ও নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতার অধিকারী এবং একমাত্র যাদের দ্বারাই তা সম্ভব, তাদের খুঁজে বের করা, তাদের সচেতন করে তোলা এবং সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করা। মানবসমাজের সকল নিপীড়িত শ্রেণিগুলি এতকাল পর্যন্ত যে চিন্তাগত দাসত্বের বাঁধনে থেকে জড়ত্বের শিকার হয়েছে, মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদই একমাত্র সেই চিন্তার দাসত্বের বন্ধন থেকে সর্বহারা শ্রেণিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণির সত্যকার অবস্থান কোথায়, একমাত্র মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বেই তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা থেকে জাপান, সুইডেন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, সারা দুনিয়া জুড়ে সর্বহারার স্বতন্ত্র সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। নিজেদের শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনা করে সর্বহারা শ্রেণি ক্রমে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়ে উঠছে, পুঁজিবাদী সমাজের কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করছে, আরও নিবিড়ভাবে নিজেদের সংগঠিত করছে এবং শিখছে কী করে নিজেদের সাফল্যের পরিমাপ করতে হয়। সর্বহারা শ্রেণি নিজেদের শক্তিসমূহকে ইস্পাতদৃঢ় করে তুলছে এবং বেড়ে উঠছে অপ্রতিরোধ্যভাবে।

মাইক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

একের পাতার পর

আয়োজন করেছিল এসইউসিআই(সি)। শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে মিছিল বাসস্ট্যান্ডের কাছে দলীয় অফিসের পাশে এলেই পুলিশ মিছিল আটকায় এবং মাইক বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই মিছিলে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পুলিশ এসে কেন ঝামেলা করছে তা দেখে বিস্মিত হয় পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ। তাঁরা পুলিশের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং গ্রেপ্তারিতে বাধা দেন। প্রবল বিক্ষোভের সামনে পড়ে পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এস ইউ সি আই (সি) বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করে এনআরসি বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২২)

ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল ও বিদ্যাসাগর

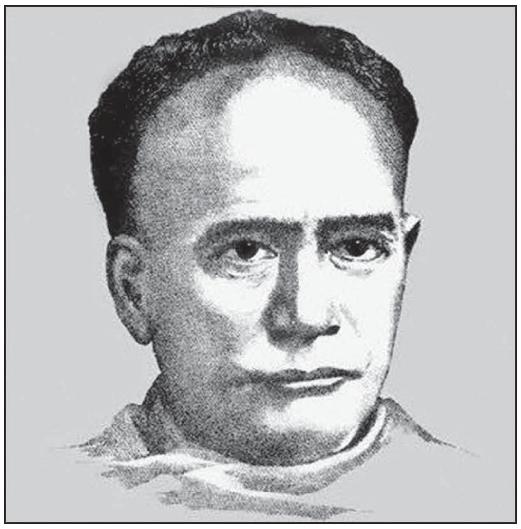

"কলেজের একটি ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছে। ফলে বাবা তার কলেজের মাইনে-টাইনে বন্ধ করে দিলেন। ছাত্রটি এল বিদ্যাসাগরের কাছে। সব কথা খুলে বলল। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কলেজে পড়ো?

—আমি আপনারই মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

বিদ্যাসাগর বললেন— বাপু, আমি তো ব্রাহ্ম নই, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনো যোগই নেই। যা হোক, তুমি ভালো বুঝে যে ধর্ম্ম ধরেছ তার উপর আমার কিছুই বলবার নেই।

ছাত্রটিকে বিদ্যাসাগর প্রত্যেক মাসে দশটাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাসে-মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে আসত ছাত্রটি।" (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র)

ইউরোপীয় নবজাগরণের যুক্তিবাদী মহাতরঙ্গ উনিশ শতকে ভারতবর্ষের মাটি ছুঁয়েছিল। রামমোহন রায় ছিলেন এই তরঙ্গের প্রথম বাহক। ভারতীয় সমাজে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে তিনি সে সময় সবচেয়ে নৃশংস প্রথা সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যার ফলে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রথা বেআইনি ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮২৬ সাল থেকে হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)-কে ভিত্তি করে ডিরোজিও-র উদ্যোগে ইয়ংবেঙ্গলের যুক্তিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এর সদস্যরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কিছুটা উগ্র পথ নেওয়ার ফলে সমাজে খুব প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেন। একই সময়ে, সমাজসংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাসে একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে ১৮২৮ সালে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু, ইয়ংবেঙ্গল বা ব্রাহ্মসমাজ, শক্তি অর্জন করার আগেই ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় সতীদাহ সংক্রান্ত আইনের পক্ষে লড়াই ও অন্যান্য কারণে ইংল্যান্ডে গিয়ে ১৮৩৩ সালে সেখানেই প্রয়াত হন। অন্যদিকে, ডিরোজিও অকালে প্রয়াত হন ১৮৩১ সালে। যদিও তাঁরা যে নতুন জীবনবোধের অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রভাব সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলল।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে ৮ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর কলকাতায় এসে পড়াশুনা শুরু করেন। কঠোর-কঠিন অধ্যবসায় ও অসাধারণ মেধার গুণে ১৮৩৯ সালে তিনি যখন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেন, মূলত তখন থেকেই তাঁর নামের চর্চা শুরু হয় সমাজের বিভিন্ন মহলে। ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর নামের সাথে পরিচিত হতে থাকেন। এই বছরই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠন করেন এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এতে যুক্ত করার উদ্যোগ নেন। রামমোহন ধর্মীয় সংস্কারের পথে হলেও যে দৃঢ়তায় হিন্দু সমাজের অচলায়তনকে আঘাত করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নেতৃত্বের ভূমিকায় সেই দৃঢ়তার যেন কিছুটা অভাব ঘটে গেল। তাঁরা রামমোহনের চিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় গণ্ডির বেড়াজালকে ভাঙবার বদলে সেই চিন্তার গণ্ডিতেই আটকে থাকলেন। উদার ধর্মমত , জাতপাতের বিভেদের বিরুদ্ধতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাবের মধ্যেও বেদ-বেদান্ত উপনিষদের মন্ত্রই তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার হল। তাঁরা ছিলেন মূলত সমাজের উচ্চকোটির মানুষ, সমাজের নিচুতলার অগণিত মানুষের সাথে তাঁদের নাড়ির যোগ ছিল না। একদিকে প্রগতিশীলতার কথা, জাতপাতের বিরুদ্ধতা, আবার প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি অতিরিক্ত জোর, তার সাথে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চর্চাতেই দীর্ঘ সময় ব্যয়, জনজীবনের মূল সমস্যা থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সে যুগের উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বড় অংশের মধ্যে কাজ করছিল ধর্মীয় চিন্তা সম্বন্ধে দোদুল্যমানতা, আপসের মনোভাব। যে আপসের বিরুদ্ধে পার্থিব মানবতাবাদকে হাতিয়ার করে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও একথা ঠিক, ব্রাহ্মসমাদের রক্ষণশীল অংশের বাইরে এই আন্দোলনের মধ্যে থাকা উদার বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন।

১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষ হয় এবং ওই বছরই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়ে। এই পর্বে তিনি, মূলত কর্মসূত্রে হলেও, জানার প্রবল আগ্রহের কারণে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি বইপত্র ব্যাপকভাবে পড়া শুরু করেন। কলেজের পর তৎকালীন কলকাতার নামকরা অধ্যাপকদের বাড়িতে তিনি যেতেন ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চা করতে। এইসূত্রেই আনন্দকৃষ্ণ বসুর বাড়িতে তাঁর পরিচয় ঘটে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ সাল থেকে শুরু হয়)-র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সাথে। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাগত যে প্রভাব অক্ষয় দত্তের মননে প্রথম দিকে ছিল, বিদ্যাসাগরের সাথে যোগাযোগ এবং আলাপ-আলোচনার সূত্রে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছিল। অক্ষয় দত্ত নিজের লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করার আগে বিদ্যাসাগরকে দেখতে দিতেন এবং বিদ্যাসাগর সেগুলির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন বেদান্তে কেন্দ্রীভূত, সে সময় বিদ্যাসাগর মনে বলছেন, 'সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন।' অক্ষয় দত্ত এ নিয়ে গভীর পড়াশুনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসভায় দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেন 'বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং সে কারণে অভ্রান্তও নয়।' চিন্তা জগতের এই পার্থক্যের কারণে ১৮৫৫ সালের শেষের দিকে তত্ত্ববোধিনী থেকে অবসর নেন অক্ষয় দত্ত। যোগ দেন বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুলে, অধ্যক্ষ পদে। অক্ষয় দত্ত পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর বিদ্যাসাগরের সাথেও তত্ত্ববোধিনীর আর তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের কাজ ছেড়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন ১৮৪৬ সালের আগস্টে। কিন্তু কলেজের হালচাল দেখে সেপ্টেম্বর মাসেই সম্পাদককে একটি রিপোর্ট দেন, 'নোটস্ অন দ্য সংস্কৃত কলেজ'। এতে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন পড়াবার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, সব ধরনের দর্শন পড়লে "আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে"।

১৮৫০ সালের আগস্টে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর। এতে নরনারীর সম্পর্ক ও বিবাহ বিষয়ে অনন্যসাধারণ আলোচনা তিনি করেছেন। একদিকে তীক্ষ্ণ মেধা অন্যদিকে গভীর অনুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তি— ব্যক্তিত্বের এহেন উত্তাপ পেয়ে ইয়ংবেঙ্গল এবং ব্রাহ্মসমাজের বহু সদস্য বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। এঁরা অনেকেই বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতনামা লোক ছিলেন। যেমন, ইয়ংবেঙ্গলের প্রখ্যাত রামগোপাল ঘোষ। তাঁকে তাঁর বাবা বলেছিলেন, 'হিন্দু ধর্মাচরণে তোমার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।' রামগোপাল বাবাকে বলেছিলেন, "আমি আপনার সব কথা মানতে পারি এবং আপনার জন্য যেকোনও দুঃখ সইতে পারি। কিন্তু মিথ্যা বলতে পারবো না।" আরেক প্রখ্যাত ইয়ংবেঙ্গল রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ছাত্র বয়সেই তিনি একটি মামলার সাক্ষী হিসাবে কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে তখনকার নিয়মানুসারে তুলসিপাতা ও গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ নিতে হত। রসিককৃষ্ণ এভাবে শপথ নিতে সরাসরি অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" এই ধরনের মানুষ ছিলেন তাঁরা। এঁরা অনেকেই নানা স্থানে স্কুল, লাইব্রেরি ইত্যাদি গড়ে তুলেছেন। কালক্রমে তাঁরা হয়ে ওঠেন বিদ্যাসাগরের সব ধরনের সামাজিক কর্মসূচির সহায়ক এবং সাথী। এঁদের অনেকের সাথে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান গড়ে ওঠে নানা কর্মসূত্রে। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম বিধবাবিবাহ। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র এবং শিবচন্দ্র দেব সহ অনেকেই সক্রিয়ভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতেন, "উনি একটা জায়েন্ট, যেমন হেড তেমনি হার্ট।"

বিদ্যাসাগরের এক অন্যতম জীবনীকার হলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬)। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য। ব্রাহ্মসমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনী লিখেছেন তাতে তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাই ব্যক্ত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন দাস (১৮৪১ - ১৮৯৭) ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। তিনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর বিমাতা বালিকা বয়সে যখন বিধবা হলেন, তিনি আবার তাঁর বিবাহের উদ্যোগ নিয়ে সামাজিক বাধার মুখে পড়েছিলেন। এই সময় আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখেন তিনি। বিদ্যাসাগরও সাথে সাথে তার জবাবে চিঠি লিখে দুর্গামোহনকে সাহস-উৎসাহ যোগান এবং শেষপর্যন্ত সেই বিয়ে সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। নিজের অথবা অন্যের যেকোনও বিপদে-আপদে বিদ্যাসাগরই ছিলেন তাঁর প্রধান ভরসা। শিবনাথ শাস্ত্রী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কীরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়।" বিদ্যাসাগরের অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "'বেতাল বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল।"

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নানা গোষ্ঠী বহুবার তাঁর স্মরণে সভা করেছে, তাঁর নানা দিক নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছে। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট এরকমই একসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "প্রতি বছর বিদ্যাসাগরের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বক্তারা তাঁর দানশীলতা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিলেন সে বিষয়টা চাপা পড়ে থাকে। ...বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালীন সমাজের কাঠামোতে আঘাত করেছিলেন। সেইটিই তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য এবং এই কারণেই তিনি আধুনিক।" (চলবে)

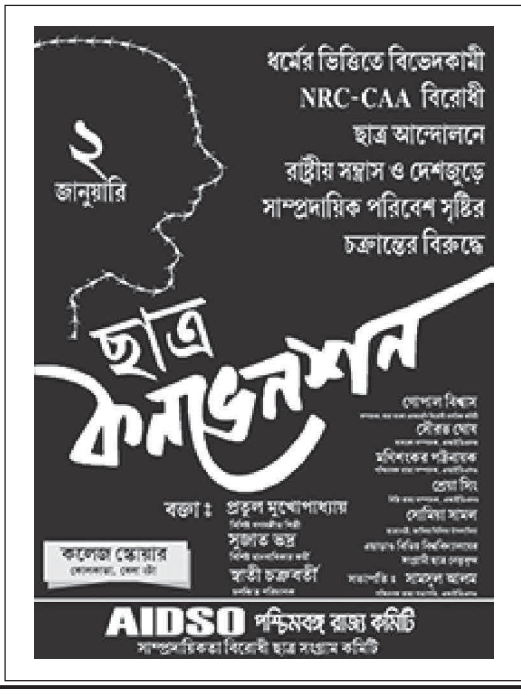

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ইতিহাসবিদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোচ্চার শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

দেশমান্য ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহকে বাঙ্গালোরে অসম্মান ও গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবের পরে বাঙ্গালোরে যেভাবে দেশমান্য ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহের উপর পুলিশি অভব্যতা এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে সরকার ও প্রশাসনের মুখোশ খুলে পড়েছে ও স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার রাস্তা তৈরি হচ্ছে।"

ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে উলঙ্ঘন করে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও বিভাজনের যে প্রক্রিয়া 'এনআরসি' এবং 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন'-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছে তার প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, লেখিকা ও সমাজকর্মী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান, শিক্ষাবিদ পবিত্র গুপ্ত, সান্টু গুপ্ত প্রমুখ।

সিএএ-র বিরুদ্ধে বহরমপুরে পদযাত্রা

শাসকের বিভেদের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে জোরদার সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর বহরমপুরে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী গুণিজনদের পদযাত্রা সংগঠিত হয়। কল্পনা সিনেমা মোড় থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত এই পদযাত্রায় পা মেলান বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলি হাসান, কৃষ্ণনাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক কামাখ্যাপ্রসাদ গুহ, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাস, বহরমপুর কলেজের গণিতের অধ্যাপক ডঃ সরিফউদ্দিন, কৃষ্ণনাথ কলেজের গ্রন্থাগারিক ডঃ নীতি মোল্লা সহ অন্যান্যরা।

এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করতে এলাকায় এলাকায় কমিটি গঠন

নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি ও বিভেদমূলক সিএএ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে গড়ে তোলার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলনের কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সর্বত্র গড়ে উঠছে অজস্র কমিটি।

তমলুক ঃ ১৫ ডিসেম্বর এক নাগরিক সভা হয় দর্জা-নিমতলায়। উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য শিক্ষক আব্দুল মাসুদ, বাসুদেব দাস, শেখ মেহবুব আলম, শম্ভু মান্না, সেখ আব্দুল রেজ্জাক প্রমুখ। আব্দুল মাসুদ বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব মন্দা, ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই-বেকারি, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে ব্যাপকহারে কৃষক আত্মহত্যা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থা প্রভৃতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। জনজীবনের এসব মূল সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে বিজেপি নেতারা এনআরসি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমিছিল

চালুর নামে দু'কোটি মানুষকে বিতাড়িত করার হুমকি দিচ্ছে। এই সভা থেকে সিএএ-এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, দর্জা-নিমতলা শাখা গঠিত হয়। শেখ মেহেবুব আলম সভাপতি এবং শম্ভু মান্না ও শেখ মোস্তাফা আলি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যান্য জেলাতেও কমিটি গঠন শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি

সোনার পুর ঃ সোনারপুরের মকরমপুর বিএড কলেজ অডিটোরিয়মে দেড় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এনআরসি ও সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল কাশেম মুন্সিকে উপদেষ্টা, কাজি সামসুল আলমকে সভাপতি, গোলাম রসুল ডাক্তার এবং মিজানুর লস্করকে যুগ্ম সম্পাদক ও মিনতি মিত্রকে সহ-সম্পাদিকা করে ১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়া

কলকাতা ঃ ১৯ ডিসেম্বর মধ্য কলকাতার কলাবাগানে অনুষ্ঠিত এনআরসি বিরোধী পথসভায় বক্তব্য রাখেন ঠনঠনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ শুভান। তিনি বলেন, 'ভগৎ সিং, আসফাকউল্লার সংগ্রামে স্বাধীন হওয়া এই দেশকে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে দেব না'। বক্তব্য রাখেন এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জুবের রব্বানি। উপস্থিত ছিলেন ঠনঠনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ আকবর আলম মল্লিক। তিনি উল্লেখ করেন, আজকের এই সভার উদ্যোক্তরাও হিন্দু ভাইয়েরা। কোনও ভেদাভেদের মানসিকতা না রেখে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে একটি ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শাকিল এজাজ, শরিক আনওয়ার প্রমুখ। সকলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলে এলাকায় এলাকায় কনভেনশন করার এবং ১৪ জানুয়ারি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা জেলা নাগরিক কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য জনসাধারণকে আবেদন জানান।

জাকারিয়া স্ট্রিট। নিচে কলাবাগান। কলকাতা

২১ ডিসেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে গঠিত হয় এনআরসি-বিরোধী নাগরিকদের আহ্বায়ক কমিটি। যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ মকবুল হোসেন এবং মহম্মদ জুবেইর। ২২ ডিসেম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটে প্রকাশ্য সভা থেকে ডাঃ নেহাল আহমেদ-কে সভাপতি, ডাঃ প্রদ্যুৎ হাজরা এবং সৈয়দ হাসান-কে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে এনআরসি-বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। উত্তর কলকাতায় ২২ ডিসেম্বর সিরাম থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন হলে এক আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে কমিটি গঠিত হয়। প্রসেনজিৎ রক্ষিত, কৃষাণু দে ও প্রত্যুষ সিকদারকে আহ্বায়ক করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

হাবড়ায় সভা

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া স্টেশনে ২২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে এনআরসি ও সিএএ বিরোধী এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক কমরেড পরিমল হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় এক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com